সি পি আই (এম) এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে

১

পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে সি পি আই (এম)-র খসড়া কর্মসূচীর উপস্থাপনায়

এম. বাসবপুন্নাইয়া

দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে সি পি আই (এম)-র খসড়া
কর্মসূচীর উপস্থাপনায়
এম. বাসবপুন্নাইয়া

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৪

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○আগরতলা

প্রচ্ছদ : পুষ্পল দেব

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

দাম : ২০ টাকা

কয়েকটি কথা

আজ থেকে ৫০ বছর আগে, ১৯৬৪ সালে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর — ৭ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৭ম কংগ্রেসে এই পার্টির জন্ম হয়।

কেউ কেউ এটাকে বলেন— ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজনের ৫০ বছর। দীর্ঘ মতাদর্শগত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী মতবাদ, বিপ্লবী কর্মসূচী ও বিপ্লবী সাংগঠনিক নীতিমালা নিয়ে গঠিত সি পি আই (এম), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামের প্রকৃত উত্তরাধিকার। এ অবস্থায় মতাদর্শগত দিক থেকে একে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন বলা অনুচিত।

কেউ কেউ এমনও বলেছেন, কিংবা আজও বলে তৃপ্তি পান যে, পার্টিটা বিভাজিত হয়েছে বিদেশি কমিউনিস্ট পার্টি, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের প্রভাবে। যারা এটা বলেন তাদের জানা উচিত যে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত লড়াই শুরু হয় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান দুই শক্তির মতান্তরের অনেক আগে থেকে। ব্রিটিশের হাত থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার পর স্বাধীনতা ও ভারতের ক্ষমতায় আসা শাসকশ্রেণীগুলির চরিত্রায়ণ এবং ভারতীয় সমাজ বিপ্লবের স্তর ও ধারা নিয়ে বিশেষভাবে এই মতানৈক্য চলতে থাকে। সেই সময় পার্টির কোনও কর্মসূচী না থাকাটা এই বিতর্কের অবসানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

১৯৬১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিজয়ওয়াড়ায়, ৭-১৬ এপ্রিল। সেই কংগ্রেসে বেশ কয়েকটি খসড়া কর্মসূচী পেশ করা হয়েছিল। ই এম এস নাম্বুদিরিপদ একটি সুনির্দিষ্ট খসড়া কর্মসূচী উত্থাপন করেন। এস এ ডাঙ্গে- পি সি যোশী- জি অধিকারী পেশ করেন সমসাময়িক পরিস্থিতির ওপর একখানা প্রস্তাব। ভূপেশ গুপ্ত ও পি রামমূর্তি যৌথভাবে একটি খসড়া কর্মসূচী উত্থাপন করেন। কিন্তু, এগুলোর কোনওটি নিয়েই পার্টি কংগ্রেসে আলোচনার সুযোগ ছিলো না। তবে, রাজনৈতিক প্রস্তাবে 'জাতীয় গণতন্ত্র' ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কথা বলা হয়েছিল।

৬ষ্ঠ কংগ্রেসে ১০৯ জনের কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হয়েছিল। পার্টি কংগ্রেসের পর '৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় প্রচুর সংখ্যক কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন। এর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ডাঙ্গে-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রেণী সহযোগিতার নীতিকে প্রকটভাবে তুলে ধরে এবং তাদের মতের বিরোধীদের বিরুদ্ধে আকছার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্য ১৯৬২ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদের সভা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সমস্ত পার্টি সভ্যদের সামনে দু'টো প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এক, ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে উত্থাপিত খসড়া কর্মসূচীগুলিকে খতিয়ে দেখে যথাসম্ভব একটি খসড়া কর্মসূচী তৈরি করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক। দুই, সমস্ত শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে যে সভ্য সংখ্যা ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে ছিল সেই সভ্য সংখ্যার ভিত্তিতে একটি পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করা হোক। এই কংগ্রেসেই কমিশন পার্টি কর্মসূচীর প্রস্তাব করবে। তারা বলেন, এই ভাবে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে সংখ্যা গরিষ্ঠের মত তারা মেনে নেবেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ এগুলোর কোনোটাই গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় ১৯৬৪ সালের ৭-১১ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালিতে একটি কনভেনশন সংগঠিত করে কলকাতায় ৭ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করা হয়। গঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। প্রসঙ্গত বলা দরকার 'মার্কসবাদী' কথাটি পরে যুক্ত হয়েছে। সংসদীয় প্রথা মানতে গিয়ে এটা করতে হয়েছে। কারণ, একই নামের দু'টো দল নির্বাচনে লড়তে পারে না।

৭ম কংগ্রেসে এই প্রথম পার্টি কর্মসূচী গৃহীত হয়। খসড়া কর্মসূচী উত্থাপন করতে গিয়ে কমরেড এম বাসবপুন্নাইয়া যে মতাদর্শগত বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন, এ বইটি তারই বঙ্গানুবাদ। ২০১৪ কমরেড এম বাসবপুন্নায়ার জন্মশতবর্ষও বটে। সেই দিক থেকে সি পি আই (এম) গঠনের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন এবং কমরেড এম বাসবপুন্নাইয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন — এই দু'টো কাজই এই বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। রাজ্য শিক্ষা সাব-কমিটি 'সি পি আই (এম) গঠনের ৫০ বছর পূর্তি' উপলক্ষে একটি সিরিজ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা ও বক্তৃতা এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হবে। কমরেড বাসবপুন্নাইয়ার বক্তৃতাটি এই সিরিজের একটি।

রাজ্য পার্টি শিক্ষা সাব-কমিটির এই প্রয়াসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কমরেড সত্যব্রত ভট্টাচার্য ও ডঃ হারাধন দেবনাথ এ কাজে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রকাশনার কাজে যুক্ত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সমগ্র সিরিজটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হোক— এই প্রত্যাশা করি।

(বিজন ধর)

সম্পাদক, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি

সি পি আই (এম)

আগরতলা

১১-০৯-২০১৪

[কম্‌রেড এম. বাসবপুন্নাইয়ার জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে ১৪ই ডিসেম্বর , ২০১৩-তে। কমুউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন বাসবপুন্নাইয়া। অন্ধ্রপ্রদেশে কমুউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামেও তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট নেতা। ভারতের কমুউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠনপর্বে তিনি রেখে গেছেন অসামান্য অবদান। সি পি আই (এম) র মতাদর্শগত ভিত্তি গঠনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর জন্ম শতবর্ষ পালনের অঙ্গ হিসেবে এখানে ১৯৬৪ সালের সপ্তম কংগ্রেসে পার্টির কর্মসূচীর উপস্থাপনায কমঃ বাসবপুন্নাইয়া যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা প্রকাশ করা হচ্ছে। এ বক্তৃতা এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। এই উপস্থাপনা তাঁর রাজনৈতিক- মতাদর্শগত বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যই প্রকাশ করে]।

শুরুর কিছু কথা

১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মতাদর্শগত প্রশ্নে অনৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভক্ত হয়ে গঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। ঐক্যবদ্ধ পার্টি সি পি আই কর্তৃক ১৯৫১ সালে গৃহীত কর্মসূচীর অনেকগুলি বক্তব্য নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে চরম মতপার্থক্যের জন্ম দেয়। এই সমস্ত মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা করা হলেও তা দূর করা সম্ভব হয়নি।

১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি রাশিযার তাসখন্দে গঠিত হলেও তার কোন কেন্দ্রীয় কমিটি বা কর্মসূচী ছিল না। শুধুমাত্র কয়েকটি গ্রুপ ছিল। ১৯২৫ সালে কয়েকটি গ্রুপের প্রাদেশিক নেতারা মিলিত হয়ে একটা কর্মসূচী রচনা করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু মতের মিল না হওয়াতে ১৯২৮ সালে তা বাদ দেওয়া হয়। আবার ১৯২৮ সালে কয়েকজন নেতৃত্ব মিলিত হয়ে পার্টির একটা কর্মসূচী রচনা করতে সমর্থ হন। তার নাম দেওয়া হল "ড্রাফট প্ল্যাটফর্ম অব এ্যাকশন"। এই কর্মসূচী কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুমোদনের জন্য মস্কোতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১৯৩০ সালে আন্তর্জাতিকের মুখপত্র "ইনপ্রেকর" এর ১৯শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ১৯৩৩ সালে কমিউনিস্ট নেতারা মুক্ত হয়ে আসার পর সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। সেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে " ড্রাফট প্ল্যাটফর্ম অব এ্যাকশন" এর ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দলিল গৃহীত হয়। এই রাজনৈতিক দলিলটিকেই কর্মসূচী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে এই দলিলের কথা পার্টির নেতারাই ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে কোন কর্মসূচী ছাড়াই পার্টির কাজকর্ম চলতে থাকলো।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৬ সাল থেকেই পার্টির অভ্যন্তরে শোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের লড়াই শুরু হয়েছিল। পার্টির প্রথম সম্পাদক জি. আধিকারীর (গঙ্গাধর আধিকারী) সময়কালে পার্টি বাম বিচ্যুতির কবলে পড়ে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেসে সেই ভুল ত্রুটিগুলি

ধরিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় সম্পাদক পি. সি. যোশি (পুরণ চাঁদ যোশি) সেই বাম বিচ্যুতি থেকে পার্টিকে উদ্ধার করতে গিয়ে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির শিকার হন।

" ডক্যুমেন্ট অব কমিউনিস্ট মোভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া'র " ৬ষ্ঠ খন্ডে (১৯৪৯-৫১) উল্লেখ করা হয়েছে, পার্টির ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রথমত, আমাদের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার ফলে, অতীতে আমরা প্রত্যেকবার কি ধরণের রাজনৈতিক বিচ্যুতির শিকার হয়ে পড়েছি। দ্বিতীয়ত একটি মার্কসবাদ বিরোধী বিচ্যুতিকে আরেকটি মার্কসবাদ বিরোধী বিচ্যুতির মাধ্যমে রোধ করা সম্পূর্ণ অ-মার্কসীয় কাজ। দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ এবং বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ এই দুই ধরণের বিচ্যুতিই যতক্ষণ না পার্টির একটি সঠিক মার্কসীয় লাইন গৃহীত হয়, ততক্ষণ এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে নকল লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু যখন একটি সঠিক লাইন গৃহীত হয়, তখন, এই সঠিক মার্কসীয় লাইন দক্ষিণ ও বাম এই দুই দিক থেকেই আক্রান্ত হয়। কারণ, দক্ষিণপন্থী শোধনবাদ এবং বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ একই রোগের দুই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, আর তা হচ্ছে " বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ " যা সর্বহারা পার্টির সবচেয়ে বড় শত্রু। কমঃ স্টালিনকে এই দুই বিচ্যুতির মধ্যে কোনটি বেশি ক্ষতিকারক প্রশ্ন করা হলে স্টালিন বলেছিলেন " একটি অপরটির মতোই খারাপ"।

পার্টির এই আভ্যন্তরীণ সংকটের মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হলো ১৯৪৮ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে। সেখানে একটি দলিল গৃহীত হয়। কিন্তু দুই বছরের মধ্যেই সেই দলিলের বিশ্লেষণ ভুল বলে প্রমাণিত হয়। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত দেশের পার্টি সদস্যরা জানার আগেই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে সে সব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবৃতি দিতে লাগলেন। পার্টি নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা নিয়েও তখন দেখা দিল প্রশ্ন। পার্টি প্রায় বিভাজনের মুখে। সদস্য সংখ্যা, গণসংগঠন, শ্রমিকসহ অন্যান্য সংগঠনের সদস্য সংখ্যা অনেক কমে যায়। দেশের বড় বড় ধর্মঘটসহ অন্যান্য সংগ্রামে যে কমিউনিস্ট পার্টি এতদিন নেতৃত্ব দিত, পার্টি সেই যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। বদলে সোস্যালিস্টরা সেই নেতৃত্বে এগিয়ে এলো। এই অবস্থার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে পার্টির কর্মসূচীর অনুপস্থিতি। বলা যায়, ১৯৩৩- ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কোন কর্মসূচীর অভাবে একটি হালহীন নৌকার মতো ভাসতে লাগলো।

এই অবস্থার অবসানের উদ্দেশ্যে পার্টির চারজন নেতাকে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন কমঃ রাজেশ্বর রাও, এম বাসবপুন্নাইযা, অজয় ঘোষ এবং এস এ ডাঙ্গে। গোপনে মস্কোতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এক কমিশনের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁদের পাঠানো হলো। এই কমিশনের নেতা কমঃ স্টালিনের নেতৃত্বে ১৯২৮- ৩০ সালে রচিত খসড়া কর্মসূচী যা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল, সেই খসড়াটিকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মহাফেজখানা থেকে খুঁজে এনে তার ভিত্তিতে একটি নতুন খসড়া কমসূচী

তৈরি করা হলো। এই খসড়াটিই কিছু প্রস্তাব গ্রহণ, সংশোধন, ও সংযোজনের মাধ্যমে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির এক বিশেষ সম্মেলনের মাধ্যমে পার্টির কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হয়। সাথে সাথে কর্মনীতি নিয়েও একটি দলিল গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে মাদুরাইতে পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে এই দুইটি দলিল গৃহীত হয়।

কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই দেখা গেল ১৯৫১ সালের কর্মসূচীর কয়েকটি ধারা বাস্তবের সাথে মিলছে না। তাতে রাষ্ট্রের চরিত্র, সরকারের চরিত্র, বিদেশনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচীর ধারাগুলি রাষ্ট্র ও সরকারের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, ১৯২৮-৩০ সালে বৃটিশ ভারতে রচিত খসড়া কর্মসূচীকেই কিছু সংযোজন ও সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৫১ তে স্বাধীন দেশে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ফলে অনেকগুলি ধারাই স্বাভাবিকভাবেই বাস্তবের ভুল বিশ্লেষণ বলে বিবেচিত হতে লাগলো। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের স্লোগান " এ আজাদি ঝুটা হ্যায়" আবার যেন ফুটে উঠলো। এ সম্পর্কে কয়েকটি ধারার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে। যেমন—

১ নং ধারায় বলা হয়েছে, " ভারতের জনগণের মনে এমন বিশ্বাস জাগানো হল যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ভারত স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ করেছে।"

২নং ধারায় বলা হলো "ক্ষমতাসীন নেহরু সরকার চার বছরের মধ্যেই জনগণের আশাকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করলো"।

১২ নং ধারায় বলা হয়েছে "একটা দেশের সশস্ত্র বাহিনীর স্বাধীনতা যদি সেই দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হয়, তাহলে আমাদের স্বাধীনতার মূল চাবিকাঠিটা এখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতেই রয়ে গেছে"। কর্মসূচীর শেষ প্যারাতে বলা হলো " ভারত হচ্ছে এশিয়ার সর্বশেষ বৃহত্তম পরাধীন আধা-ঔপনিবেশিক দেশ। আজও যা সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠন ও শোষণের জন্য অবারিত"।

এই ধারাগুলির মাধ্যমে বস্তুত দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করা হয়েছে।

অন্যদিকে স্বাধীন দেশের সরকারের চরিত্র সম্বন্ধে কর্মসূচীর বিভিন্ন ধারায় এমনভাবে বলা হলো যাতে মনে হবে ভারত সরকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই তল্পিবাহক একটি সরকার।

যেমন, ৭নং ধারায় বলা হয়েছে "এই সরকার বৃটিশ পুঁজির রথ চক্রের সঙ্গে বাঁধা"। ১০ নং ধারায় রয়েছে " এই সরকার হচ্ছে জমিদার ও রাজন্যবর্গের সরকার; এই সরকার হচ্ছে বৃটিশ কমনওয়েলথ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, আবার এর পরেই ১১নং ধারায় বলা হয়েছে—" এই সরকার যে জমিদার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সহযোগিতা করে চলেছে তাহলো সেই প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ বুর্জোয়াদের সরকার।" অর্থাৎ কর্মসূচীর মতে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় নেই, যার কোন বাস্তবতা নেই, কারণ কংগ্রেস দলই বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করছে।

আরও মারাত্মক হলো কর্মসূচীর ৯নং ধারাতে যেখানে ভারত রাষ্ট্রকে একটি পুলিশী রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করা হয়।

১৯ নং ধারাতে শ্রমিক সংগঠন, কৃষক, শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে বর্তমান সময়ে দেশে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব নয়, একথা বলে বলা হলো— " আমাদের পার্টি মনে করে যে, বর্তমানের গণতন্ত্রবিরোধী, জনগণবিরোধী এই সরকারের বদল করে এক নতুন জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার অবস্থা বেশ পরিণত; এই নতুন জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে সমস্ত গণতান্ত্রিক, সামন্ততন্ত্র বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী শক্তির সম্মিলনীর ভিত্তিতে"।

লক্ষনীয় বিষয় হলো এই ধারার একদিকে যেমন একচেটিয়া পুঁজি বিরোধীদের এবং অন্যদিকে তেমনি বুর্জোয়াদের সামিল করার কোন উল্লেখ নেই।

যে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯৫১ সালের কর্মসূচী রচিত হয়— সেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র " প্রাভদা" ১৯৫৫ সালে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দিল। এই স্বীকৃতি ১৯৫১ এর কর্মসূচীর মূল সিদ্ধান্তের উপরই আঘাত হানলো।

পরবর্তী সময়ে নেহরু সরকারের দেশের অভ্যন্তরে ও বৈদেশিক নাতির ক্ষেত্রে গৃহীত কিছু সিদ্ধান্ত পার্টির মধ্যে দুইটি সমান্তরাল চিন্তাধারার জন্ম দিল যা প্রতিফলিত হয় ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে। তখন থেকেই শুরু হয় শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিসমঝোতার লাইনের মতাদর্শগত লড়াই।

এই লড়াই মতাদর্শগত প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এস এ ডাঙ্গের অনুসারী অর্থাৎ শ্রেণি সমঝোতার লাইনের সমর্থকরা ১৯৬২ সালের চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারত সরকারের দালাল হিসাবে কাজ করতে শুরু করলো এবং শ্রেণিসংগ্রামের সমর্থক নেতৃত্বের একটা বড় অংশকে চীনের গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করাতে লাগলো।

এই অবস্থায় পার্টির বিভাজন অনিবার্য হিসাবে দেখা দিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৪ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে শ্রেণিসংগ্রামের প্রবক্তা ও সমর্থকরা শ্রেণি সহযোগিতার লাইনের অনুসারী শোধনবাদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন পার্টি গড়ে তোলে। সেই পার্টিই হচ্ছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। ১৯৬৪ সালের পার্টির সপ্তম কংগ্রেসেই পার্টির কর্মসূচী গৃহীত হয়।

১৯৬৪ সালের খসড়া কর্মসূচীর উপর প্রাদেশিক কমিটি, পার্টি সদস্যরা মতামত ও পরামর্শ দেন। তার উপর ভিত্তি করে সপ্তম কংগ্রেসে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য কমঃ বাসবপুন্নাইয়া তাঁর মূল্যবান উপস্থাপনা রাখেন।

সি পি আই (এম)'র সপ্তম কংগ্রেসে উপস্থাপনের জন্য তৈরি খসড়া কর্মসূচীর প্রস্তাবনায় কমঃ এম বাসবপুন্নাইয়ার ব্যাখ্যামূলক উপস্থাপনা—

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি আমাকে খসড়া কর্মসূচী উপস্থাপনায় এবং বিতর্কের সূচনা করার দায়িত্ব দেয়। সরাসরি বিষয়ে যাবার আগে আমি অনুমতি চাইছি বিষয়ের সাথে যুক্ত কিছু বিষয়ে আমার সাধারণ পর্যবেক্ষণ পেশ করতে। ছয়মাস হল খসড়া কর্মসূচী আপনাদের দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে সারা দেশে তা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্ত- পার্টি আলোচনা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমরা খসড়া কর্মসূচীর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা সম্বলিত যথার্থ রিপোর্ট দিতে অসফল হয়েছি। এরকম পরিস্থিতিতে পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেডদের জেলা ও রাজ্যস্তরে আলোচনা ও ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তাঁরা মনে করেন এভাবেই কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির যৌথ বোঝাপড়ার দিকটি প্রতিফলিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই পদ্ধতি এবং এর দ্বারা একই রূপ সহমতের ভিত্তিতে খসড়া কর্মসূচী পেশ করার বিষযটি ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেল। কিন্তু এদিয়ে এটা বোঝায়না যে, ব্যাখ্যা- মূলক যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তা ভুল। যেটা বলতে চাইছি তা হল, কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে পার্টিকে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে একতাবদ্ধ করতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট একান্ত জরুরি। আমি আপনাদের সামনে যে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট পেশ করতে যাচ্ছি তা প্রয়োজন মেটাবার একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

একটি পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ রিপোর্ট পেশ করার অসুবিধা এখনও আমরা অনুভব করছি। এর কারণগুলি হল প্রথমতঃ —কেন্দ্রীয় অফিস, জেলা ও রাজ্যস্তরের সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট এযাবৎ পায়নি। ফলে পর্যালোচনা ও উপলব্ধির কাজটা ব্যাহত হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ আমি যে ব্যাখ্যামূলক টিকা তৈরি করেছিলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি বিভিন্ন জরুরি কাজের চাপে তার চূড়ান্ত রূপ দিতে পারেনি, যা পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা যেত। তৃতীয়তঃ দুটো দলিলে যেমন, কমঃ এম বাসবপুন্নাইয়া লিখিত " ডাঙ্গে কর্মসূচী কি প্রকাশ করে " এবং কমঃ এম. বাসবপুন্নাইয়া, পি. রামমূর্তি, এইচ. কে. সুরজিৎ লিখিত " ই এম এস এর খসড়া কর্মসূচীর উপর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমাদের মতামত"- এ— যা বলা হয়েছে তার পুনরুল্লেখ করতে চাইছি না। এ দুটো পুস্তিকাতে আমরা যে দুইটি বিষয়ে একমত নই তারই সমালোচনা কেবল নেই, এগুলিতে রয়েছে খসড়া কর্মসূচী নিয়ে আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রকাশ। এগুলি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সহমত প্রতিফলিত করে এবং তা পার্টি কংগ্রেসের দলিল হিসাবে আপনাদের হাতে রয়েছে। বর্তমানে আমি যে রিপোর্ট পেশ করতে যাচ্ছি তাতে পুনরুল্লেখ বর্জন করা হয়েছে এবং এতে অন্যান্য সব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। অতএব আমার রিপোর্ট একটি সম্পূরক ধর্মী এবং উপরে যেসব বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই সব একত্রে কর্মসূচীর একটা ব্যাখ্যামূলক

অংশ হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে। আমি আশা করছি, প্রতিনিধি কমরেডরা এ অসুবিধার দিকটা বুঝতে পারবেন এবং এর ফলে পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা রিপোর্টের সীমাবদ্ধতাও বুঝতে পারবেন।

কর্মসূচী আলোচনার আগে আমি চাইছি ই. এম. এস যে পরামর্শ ও প্রস্তাব রেখেছেন তাতে কিছুটা আলোকপাত করতে। ই. এম. এস চেয়েছিলেন কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার কাজটা পিছিয়ে দিতে যাতে সব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার পর একটা পরিণত খসড়া কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু তেনালী কন্‌ভেনশনে এবং জেলা ও রাজ্য পার্টি সম্মেলনে যে সহমত প্রকাশ করা হয়েছে তাতে এ প্রস্তাবের সমর্থন মেলেনা। পার্টি কর্মসূচীর প্রয়োজনটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা বলা হচ্ছে না যে, বর্তমানে যে খসড়া কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে তাই যথার্থ বা আমাদের যৌথ অভিজ্ঞতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে আরও ভাল খসড়া কর্মসূচী তৈরি করা যাবে না। আমাদের মতে বর্তমান সময়ে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন যে কঠিন সংকটকালে এসে পৌঁছেছে, তা থেকেই কর্মসূচীর তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর চেয়ে ভাল খসড়া তৈরি করতে গিয়ে দেরি হবে, তাতে লাভ ও সুবিধার চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। বিলম্বের ফলে আমাদের পার্টি মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হবে। কারণ শোধনবাদীরা এ সময়ের মধ্যে নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে হাজির হবে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধীরাও এ দেরির সুযোগ নিতে পিছুপা হবে না। এখনই কেন পার্টি কর্মসূচী দরকার তা আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ই. এম. এস এর খসড়া কর্মসূচীর সমলোচনামূলক টীকার উপর মন্তব্যে, যা আপনাদের হাতে রয়েছে, তাই এগুলির পুনরুল্লেখের প্রয়োজন দেখছি না, কিন্তু বর্তমান বিষয়ের সাথে যুক্ত এক-দুটো বিষয় উল্লেখের জন্য আপনাদের অনুমতি চাইছি।

আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, একদিকে প্রতিনিয়ত শোধনবাদী প্রচার মাধ্যম আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াচ্ছে, অন্যদিকে কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী একচেটিয়া প্রেসও একই কাজ করে চলেছে। তারা ইচ্ছে করে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করছে। এই বলে কুৎসা রটাচ্ছে যে, 'আমরা পিকিং এর দালাল'। আরও বলছে আমরা পার্টিকে '১৯৪৮-৫০ এর দুঃসাহসিক রাজনৈতিক কৌশলগত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি' এবং আমরা " আশু এবং উগ্র বিপ্লবের" পক্ষপাতি ইত্যাদি। এসবের পরিবর্তে শোধনবাদীরা বর্তমানে যে বিতর্কিত বিষয়গুলির মুখোমুখি যেমন, ভারতে বর্তমানে রাষ্ট্র এবং সরকারের শ্রেণি চরিত্র, পুঁজিবাদী পথ ও তার ভবিষ্যত, বিপ্লবের স্তর, প্রকৃতি এবং রণনীতি কি হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমাদের সহযোগিতা না করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিতর্কের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করছে এবং জনগণ থেকে আমাদের বিছিন্ন করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে লাগাতার ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লড়াই জারি রাখতে হবে। একটা

পার্টি কর্মসূচী, যাতে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে সমস্ত মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছি, তা যদি পার্টি সদস্য ও জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে আমাদের শত্রুপক্ষের সমস্ত দুরভিসন্ধিমূলক আক্রমণ ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে পারব। কাজেই এর গুরুত্ব ছোট করে দেখার কোন সুযোগ নেই। ইতোমধ্যেই কর্মসূচী-কেন্দ্রিক আলোচনা ও বিতর্ক বিরোধী শিবিরকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত করে তুলছে। আমাদের এই আক্রমণাত্মক ভূমিকা জারি রাখতে হবে।

এটা বলা যেতে পারে যে, এ মুহূর্তে পার্টি কর্মসূচীর উপর আলোচনার প্রচেষ্টা, যেখানে আমাদের মধ্যেই রয়েছে বিস্তর পার্থক্য, তা পার্টির একতা প্রতিষ্ঠা না করে অনৈক্যকেই বাড়িয়ে তুলবে। আমি ভিন্নমত পোষণ করি এবং মনে করি পার্টিতে একতা প্রতিষ্ঠার এটা একটা মূল্যবান পদক্ষেপ। বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝার জন্য ও আমাদের আরও চেতনাসমৃদ্ধ করার প্রয়োজনে লেনিনের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ, যা ১৮৯৯ সালে পার্টি কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছিল তা উল্লেখের অনুমতি চাইছি। সে সময় লেনিন বলেছিলেন— কর্মসূচীর বিস্তৃত ব্যাখ্যার সময় এটা নয় বলে কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন কারণ এতে সোস্যাল ডেমোক্রেটদের মধ্যে যে মতপার্থক্য আছে তা বাদানুবাদে পরিণত হতে পারে। আমি মনে করি বিপরীতটাই সত্যি— অর্থাৎ এ থেকেই কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যাচ্ছে। তর্ক যখন শুরুই হয়েছে, খসড়া কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা, তা থেকে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ পাবে এবং এতে করে আলোচনাটা হবে সার্বিক। তর্ক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য এবং এর আশু কাজ ও কৌশল সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটদের মধ্যে নতুন একটা আগ্রহ জন্ম নিয়েছে। খসড়া কর্মসূচীর আলোচনার জন্য এই নতুন আগ্রহের বেশ প্রয়োজন। অন্যদিকে এ তর্ককে ফলপ্রসূ করতে হলে এটা যাতে ব্যক্তিগত শত্রুতার স্তরে না পৌঁছায়, ধারণায় যেন অস্পষ্টতা না জন্মায়, শত্রু মিত্র যেন না গুলিয়ে ফেলে সেজন্য কর্মসূচীর বিষয়টিকে তর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এ তর্ক তখনই সফল, যদি তা মতপার্থক্যগুলি কিসের উপর ভিত্তি করে, এগুলো কতটা গম্ভীর, এ পার্থক্যগুলি কি বাস্তবিক না আংশিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে, এ পার্থক্যগুলি একই পার্টিতে থাকা কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়গুলো স্পষ্ট করে তোলে। তর্কে কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রশ্ন যদি থাকে, তর্কে জড়িত দুটো পার্টির কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে যে বিবৃতি তারও সমাধান এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। সাধারণ কর্মসূচীর বিস্তৃত ব্যাখ্যাই পার্টিতে বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি ঘটাবে না। এটা অবশ্যই মৌলিক ধারণাগুলির চরিত্র, লক্ষ্য এবং আমাদের আন্দোলনের কাজ ইত্যাদি বিষয়গুলি একটি লড়াকু পার্টির জন্য প্রয়োজন; যে পার্টি আংশিক প্রশ্নে পার্টির সদস্যদের মধ্যে ছোটাখাটো মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদকে যদি আমাদের অবস্থার সাথে যথার্থভাবে খাপ খাইয়ে নেই তাহলে তা হবে উপদেশমূলক। উল্লেখিত প্রশ্নগুলো আমাদের পার্টিতে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত

হয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে প্রায় দু-দশকের বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমাদের সামনে রয়েছে বিভিন্ন খসড়া কর্মসূচী, কর্মসূচীগত দলিলের উপর বিভিন্ন টীকা এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে গত ছয় মাসের উপর চলছে আলোচনা। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা এ অভিযোগ করতে পারি না যে, বিস্তৃত আলোচনার কোন সুযোগ ছিল না। তবে এটাও ঠিক, আরও আলোচনা এবং গভীর অধ্যয়ন উল্লেখিত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও তীক্ষ্ণ করত। যা হোক, এতে আমরা পাচ্ছি শক্তি এবং কর্মসূচী গ্রহণের মজবুত ভিত্তি, যাতে থাকছে মুখ্য বিতর্কের অবসান এবং পাশাপাশি ছোটখাট পার্থক্য দূর করার সুযোগ।

আমরা এ পর্যন্ত যা আলোচনা করেছি তার বাইরে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একটা মার্কসবাদী পার্টি কর্মসূচীতে কি কি বিষয় থাকা উচিত অর্থাৎ এর গঠন, কাঠামো, বিষয়বস্তু ইত্যাদি কি হবে। এর উত্তর আমি স্বল্প পরিসরে দেবার চেষ্টা করেছি "কমঃ ই. এম. এসের আলোচনামূলক টীকার মন্তব্যে"। যেহেতু আমাদের অনেকেই এ বিষয়টার সাথে সুপরিচিত নই, তাই এ বিষয়ে লেনিন কি বলেছিলেন তা স্মরণ করতে পারি। তিনি ১৮৯৯ সালে সোস্যাল ডেমোক্রেটদের কর্মসূচী নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন এর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করতে গিয়ে বললেন :

আমাদের মতে রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কর্মসূচীতে যে অংশ থাকা উচিত তা হল ঃ

(১) রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা।

(২) পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি যেমন দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের বর্ণনা।

(৩) আমাদের লড়াই সংগ্রামের মূল ভিত্তি হল সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রাম।

(৪) সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য—রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা, এ লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য এবং আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রের বর্ণনা।

(৫) শ্রেণী সংগ্রামের রাজনৈতিক প্রকৃতি কি।

(৬) রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের বর্ণনা, যেখানে মানুষের অধিকার খর্বিত, জনগণের উপর অত্যাচার ও শোষকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এগুলিই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পথে বাধা এবং সবার কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা জরুরি এবং এসবই হচ্ছে পার্টির আশু জরুরি কর্তব্য।

(৭) সকল পার্টি ও জনগণের অংশ যারাই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং আমাদের সরকারের বাকচাতুর্যপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবে আমাদের পার্টি তাকেই সমর্থন করবে।

(৮) মৌলিক গণতান্ত্রিক চাহিদাগুলির বর্ণনা।

(৯) শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণের সাথে যুক্ত চাহিদাগুলির বর্ণনা।

(১০) কৃষক সম্প্রদায়ের কল্যাণমূলক দাবিগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা।

আমরা আমাদের খসড়া কর্মসূচী যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাব লেনিন যা যা বলেছেন তাই সাধারণভাবে এতে রয়েছে। যেমন এতে আছে :

(১) ভারত কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব কতটুকু।

(২) ভারতীয়দের নতুন রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র কি। এটা আসলে বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে বুর্জোয়া - জমিদার রাষ্ট্র।

(৩) এতে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে একটি রাষ্ট্র ও সরকার প্রথমত পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তৃতীয় পর্বে দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাইছে। দ্বিতীয়ত বিদেশি পুঁজির বিরোধিতা না করে জমিদারতন্ত্রকে উচ্ছেদ না করে, কিভাবে বিদেশি লগ্নিপুঁজির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে এবং জমিদারতন্ত্রের সহযোগিতায় দেশে আধুনিক পুঁজিবাদ গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণ করতে সচেষ্ট।

(৪) সরকারের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা অর্থাৎ সরকারের দু-দশকের কৃষি, শিল্প ও বৈদেশিক নীতির যথার্থ মূল্যায়ন।

(৫) রাষ্ট্রের কাঠামোর বিশ্লেষণ এবং পাশাপাশি এটা দেখানো যে, বুর্জোয়া-জমিদার স্বার্থরক্ষাকারী সরকারী নীতির ফলে প্রকৃত গণতন্ত্র থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং এসব নীতির কারণে দেশের জাতীয় সংহতির পরিবর্তে ক্রমবর্ধমানভাবে দেখা দিচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতা।

(৬) ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্য এবং জনগণতন্ত্রের আশু উদ্দেশ্য কি এবং এতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের দাবি- সমূহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা।

(৭) ভারতীয় বিপ্লবের স্তর ও রণনীতি কি অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যাস কিরূপ, কারা বিপ্লব বিরোধী এবং বিপ্লবী জোটে কারা অংশগ্রহণ করতে পারে তার বর্ণনা।

(৮) একটা সুদৃঢ় মার্কসবাদ - লেনিনবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের আহ্বান রাখা এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চালু রাখা, যা হচ্ছে বিশ্বজোড়া চালু জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির অংশ। আমরা যদি মনে করি উক্ত বর্ণনা অপর্যাপ্ত ও যথাযথ নয়, পার্টি কংগ্রেস এর শক্তিশালী পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারবে।

আমাদের খসড়া কর্মসূচীর কয়েকটা বিশেষ বিষয়

বর্তমান কর্মসূচী উপস্থাপনা করতে গিয়ে একটি মৌল বিষয় পরিবর্তিত হয়েছে তা হল মূল কর্মসূচীগত বিষয় থেকে কৌশলগত দিকটাকে পৃথক করে দেখানো। এ দিকটার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছি যাতে আমরা আলোচনার মাধ্যমে কর্মসূচীকে আরও উন্নতমানের

করতে পারি। আমরা পার্টি কর্মসূচীর মত গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিয়ে যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হব, তখন আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা থাকবে তা যাতে একটা বৈজ্ঞানিক দলিলের চাহিদা পূরণ করতে পারে। কারণ এ দলিল বিপ্লব চলাকালীন সময় পর্যন্ত অর্থাৎ বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্তর সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বৈধ থাকবে। এতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় থাকবে, যেমন বর্তমান রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র, বিপ্লবের স্তর- রণনীতি ও প্রকৃতি, বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির কাজ ও ভূমিকা ইত্যাদি। কর্মসূচীকে কৌশলগত বিষয় দিয়ে ভারি করা হবে না, যা কিনা সময় সময় বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি, ক্ষমতাসীনের অবস্থান, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দ্রুত পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনার মাধ্যমে স্থির হবে। যদি কর্মসূচীতে কর্মসূচীগত বিষয়ের সাথে কৌশলগত বিষয় মিলিয়ে ফেলা হয় তবে এর স্বাতন্ত্র্য, অস্তিত্ব ও স্থায়ী চরিত্র হারিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা 'কর্মসূচী ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের' মিশ্রিত রূপে পরিণত হয় এবং পরিবর্তিত ঘটনার সাথে এরও ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তাই লেনিন বলেছেন :

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কর্মসূচীতে কৌশলগত বিষয়ের ইঙ্গিত থাকবে না ***** উপায়ের বিষয়টা খোলা রাখতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে জঙ্গি সংগঠনের ও পার্টি কংগ্রেসের জন্য। সেখানেই স্থির হবে পার্টির কৌশলগত লাইন কি হবে। কৌশলগত বিষয় কদাচিৎ পার্টি কর্মসূচীতে স্থান পাবে। যেমন, নীতিগত প্রশ্নে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে এমন অংশের প্রতি আমাদের মনোভাব কি হবে। কৌশলগত বিষয় পার্টি পত্রিকাতে আলোচিত হবে, কারণ তা পার্টি কংগ্রেসেই উঠে এবং সেখানেই স্থির হয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে লেনিনের উক্তির সাধারণ বৈধতা ছাড়াও একটা বিশেষ অর্থ ও গুরুত্ব রয়েছে। কারণ আমাদের পার্টির দীর্ঘ দিনের অস্তিত্ব ও কাজের মধ্যে একটা প্রথা লক্ষ্য করা গেছে যেখানে মাঝে মাঝে অনেক বিষয় সম্বলিত রাজনৈতিক প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে, যাতে কর্মসূচীগত ও কৌশলগত বিষয় অপরিচ্ছন্নভাবে একীভূত হয়ে গেছে। এমনকি ১৯৫১ সালের পার্টি কর্মসূচীতেও, অন্যান্য ত্রুটি ছাড়াও এধরনের ভুল রয়েছে। ঐ সময়ের প্রেক্ষিতে যে অর্থনৈতিক সংকট আমাদের অর্থনীতিতে চলছিল তার আলোকে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি এবং সেভাবে সরকারের বৈদেশিক নীতির মূল্যায়ন করে পার্টি কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি গভীরভাবে এবিষয়টি ভাবার জন্য এবং আমরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেটা যেন কর্মসূচী ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের মিশ্রণ না হয়ে দাঁড়ায়। সর্বতো চেষ্টা চালাতে হবে যাতে অতীতের এ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি এবং খসড়া প্রস্তাবকে নির্দেশিত পথে এবং উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি, অতীতের মত যেন না হয়।

(II)

দ্বিতীয় যে বিষয়টি কর্মসূচীতে শোধরানো হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এবং বর্তমান ভারত রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীচরিত্র কি, সে বিষয়ে। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শোধরানোর কাজের দুটো দিক রয়েছে। প্রথমত এ ধরনের ভ্রান্ত ও গোঁড়া ধারণা যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বহাল ছিল তা থেকে পার্টিকে মুক্ত করা এবং যা আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক প্রস্তাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ১৯৪৭ সালের মাউন্টব্যাটন রোঁয়েদাদের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব, ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের থিসিসসমূহ, ১৯৫০ সালের বাম বিচ্যুতি সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং এমনকি ১৯৫১ সালের পার্টি কর্মসূচীও। যেহেতু আমরা ১৯৫১ সালের পার্টি কর্মসূচীকে বিস্তৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুনভাবে উপস্থাপনা করছি, তাই অতীতের সমস্ত সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির দিকগুলি থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত জরুরি। একই সাথে ডাঙ্গেপন্থীরা ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত খসড়া কর্মসূচীতে যে ডানসুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদী পথ ও শ্রেণীসমঝোতার লাইন প্রকাশ করেছে বর্তমানে তা চূড়ান্ত সংশোধনবাদের রূপ নিয়েছে। এসব বিষয়কে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

এধরনের ভুলের উৎস ও প্রকৃতি কি? খসড়া কর্মসূচীতে কি ধরনের সুনির্দিষ্ট সংশোধন চাওয়া হয়েছে। যে মৌলিক ত্রুটি, যা থেকে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে অনেক ভুলের মূলে রয়েছে, তা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শ্রেণীশক্তিসমূহের পারস্পরিক নতুন দিকটা মূল্যায়নে ব্যর্থতা। সোভিয়েত রাশিয়ার হাতে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি চীন বিপ্লবের সফলতা, সবই জন্ম দিল একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের। পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই, এসব কিছু পৃথিবীর রাজনৈতিক চিত্রের মৌলিক পরিবর্তন ঘটাল। শক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গেল এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে এল। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ সার্বিকভাবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষভাবে, যা ছিল উপনিবেশ মালিকানায় সর্ববৃহৎ এবং যার বিরুদ্ধে ছিল আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ল। নতুন এ বাস্তবতার মূল্যায়নে ব্যর্থতা এবং পরবর্তী সময়ে এর ফলে আমাদের রাজনৈতিক ও কৌশলগত নতুন পরিস্থিতিতে নতুন লাইন নেবার যে প্রয়োজন ছিল তা না করে যুদ্ধপূর্ব শক্তির মূল্যায়ন করে তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক লাইন স্থির করা হল।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি ধরা যাক। যে যে বিষয়গুলি নিয়ে অবিরাম আলোচনা হয়েছিল সেগুলি হল, এই ক্ষমতা হস্তান্তরের শ্রেণীগত অর্থ কি, নতুন রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র কি, স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক না সত্যি, ভারতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পর্ব কি শেষ না বর্তমান, বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব কিনা, যদি সম্ভব কতদূর তা সম্ভব, ইত্যাদি ইত্যাদি। এধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ১৯২০ সালে

দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিসে যার ভিত্তি ছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের বিষয়ে অথবা পরবর্তী সময়ে বিষয়টির সাথে যুক্ত তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দলিলে। উক্ত থিসিসে বলা হল— " সব দেশের বিশেষ করে পশ্চাদপদ দেশের শ্রমজীবী জনতাকে বুঝাতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রতারণা করে স্বাধীন রাষ্ট্রের নামে তাদের ওপর অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামরিকভাবে নির্ভরশীল রাখে। আধুনিক আন্তর্জাতিক অবস্থায় একমাত্র সোভিয়েত রিপাবলিক ছাড়া অন্য পরাধীন ও দুর্বল দেশ সত্যি মুক্ত নয়"।

এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলের প্রয়োগে যদি আমরা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত 'আধুনিক আন্তর্জাতিক অবস্থার' দিকটা লক্ষ্য না করে বৃটিশের ক্ষমতার হস্তান্তরের বিষয়টি না ভাবি তাহলে অনেকগুলি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাব। স্পষ্টত ১৯২০ -৩০ সালের অবস্থা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা ও আধুনিক আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মাউন্টবাটন রোঁয়েদাদের উপর রাজনৈতিক প্রস্তাবে ভারত একটি 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসিত' রাষ্ট্র ছাড়া কিছুই নয়, দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিসে ক্ষমতার হস্তান্তরকে 'প্রতি -আক্রমণের জন্য সাম্রাজ্যবাদের ধূর্ত পশ্চাৎপসারণ, সরাসরি শাসন থেকে পরোক্ষ শাসন, নতুন রাষ্ট্র ব্রিটিশকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের বড় বা ছোট অংশীদার হিসাবে দেখা, নতুন সরকারকে ১৯৫১ সালের পার্টির কর্মসূচীতে এমন এক ধরনের সরকার যা ব্রিটিশ পুঁজির রথের চাকায় বাঁধা এবং যা পুতুলের মত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ইচ্ছার উপর ঝুলছে এবং এমন একটা সরকার যা ব্রিটিশের বৈদেশিক নীতি কার্যকর করছে— এধরনের দ্রুত, একপেশে, অতিসরল এবং ভুল সিদ্ধান্ত হল উপরিউক্ত আন্তর্জাতিক শ্রেণী শক্তির সম্পর্কের ভুল মূল্যায়নের ফল। যদিও বড় ধরনের এসব পরিবর্তন ১৯৪৭-৪৯ সালে মূল্যায়ন করা যায় নি। এমন কি চীনের ঐতিহাসিক সফল বিপ্লব ও এর পরবর্তী ঘটনা আমাদের ওপর সঠিক মূল্যায়নের দায়িত্ব বর্তালেও, আমরা তা করতে ব্যর্থ হয়েছি। এসবের পরিণাম হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে বড় করে দেখা, এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, সামরিক ক্ষমতা অটুট আছে এবং যার দ্বারা এই শক্তি আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে একটা আনুষ্ঠানিক ও নকল পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সমর্থ বলে মনে করা। পাশাপাশি পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও রাজনৈতিক গুরুত্ব, দেশে দেশে পরাধীনতা থেকে মুক্তির লড়াই এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর জোরদার লড়াই সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়কে ছোট করে দেখা হয়েছিল।

শ্রেণী বিপ্লব ও বুর্জোয়াদের শর্তাধীন আত্মসমর্পণ

নিঃসন্দেহে বলা যায় আমাদের পার্টির এটা ছিল বড় ধরনের ভুল এবং পার্টি কর্মসূচীতে পরিস্কারভাবে এর শোধরানোর প্রতিফলন দেখাতে হবে। আসলে এটাই কি ছিল আমাদের সব ভুলের উৎস যা থেকে বেরিয়ে এসে সঠিক মার্কসবাদী- লেনিনবাদী লাইনে আমাদের চিন্তা ও চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি? আমি মনে করি এর চেয়ে আরও অধিক গুরুতর ভুল

রয়েছে যা সতর্ক পরীক্ষা ও দ্রুত শোধরানো প্রয়োজন। এগুলো হল ঃ বুর্জোয়াদের শ্রেণী শক্তি ও এর প্রভাবের অবমূল্যায়ন এবং অন্যদিকে শ্রেণী বিপ্লবের পরিপক্কতার দিকটাকে বড় করে দেখানো। আনুষ্ঠানিক ও নকল স্বাধীনতার ধারণা, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের শক্তির অতিরঞ্জন এবং তার বিপরীতে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন, বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের প্রভাব এবং নতুনভাবে ও নতুন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের অবমূল্যায়ন। জীবনের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, বুর্জোয়া নেতৃত্ব কিভাবে একদিকে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হিংস্র শত্রুতে পরিণত হয় এবং অন্যদিকে কাঠামোগত সমঝোতা ও সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে দ্বন্দ্ব ও দর কষাকষি করতে সমর্থ হয়। শ্রেণী বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান ভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়াদের আত্মসমর্পণ " সাম্রাজ্যবাদের চুড়ান্ত পরীক্ষা" সাম্রাজ্যবাদের "ছোট শরিক হতে সম্মত হওয়া" প্রভৃতি প্রতিনিয়ত আমরা যা বলেছি, বিষয়টা তত সরাসরি ও সরল ছিল না।

ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সমঝোতা ও মীমাংসা ঘটে একটা নির্দিষ্ট উপায়ে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত। অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি, এ থেকেই দেয়ালের লিখন পড়তে পেরে এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে মীমাংসার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে সে রাজি হল। যদিও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক বিষয়ে প্রভাব যতটুকু তৎকালীন পরিস্থিতিতে সম্ভব, নিজেদের হাতে রেখে দিতে চাইলো। স্বাধীনতা আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্বের অংশ এসব শর্ত সাপেক্ষেও ক্ষমতার হস্তান্তর ও মীমাংসার বিষয়টিকে সুবিধাজনক বলে মনে করল। এটা নিশ্চিতরূপে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতা করে নেয়া বা স্বাধীনতা আন্দোলনের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এ কথাও সত্যি যে, এই সমঝোতার অর্থ হচ্ছে লাগাতার বিদেশি লগ্নিপুঁজির সাথে সহযোগিতা করা। একইভাবে এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, দেশের বুর্জোয়া নেতৃত্ব যেকোন রকম জঙ্গি গণ- আন্দোলন সম্পর্কে ভীত এবং এরাই প্রথম এরূপ আন্দোলন থেকে সরে আসার আহ্বান জানায় পাছে এ জঙ্গি আন্দোলন তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু মূল বিষয় যা সম্পর্কে পরিষ্কার হতে হবে, তাহলো, আমাদের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতা করেছিল শুধু কি একারণেই যে তাদের শ্রেণিস্বার্থের অনুকূলে সব শর্ত ছিল বলে? এটা সহজেই বলা যায় যে, দুটো বিষয়ই সমানভাবে কার্যকরী ছিল এবং এ ছিল দুটোরই ক্রমবর্ধমান ফল। কিন্তু বিষয়টা যতটা সহজ মনে হচ্ছে তত সহজ নয়। যদি আসন্ন শ্রেণি বিপ্লবের দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এর থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে একারণেই তারা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তবে বলতে হয় যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা যা ওরা পেয়েছে তা আনুষ্ঠানিক এবং সরকার হচ্ছে একটা পুতুল বা সাম্রাজ্যবাদের অনুচর বা তোয়াজকারী ইত্যাদি। এধরনের সিদ্ধান্ত ভুল। কারণ এর মাধ্যমে

শ্রেণি বিপ্লবী শক্তিকে অতিরঞ্জিত করা, ঘটনার ওপর বুর্জোয়াদের ক্ষমতাকে ছোট করে দেখা এবং এর প্রভাবে বুর্জোয়াদের ভূমিকা, নতুন রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র, রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব, সরকারের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে ভুল মূল্যায়ন করা হবে।

এধরনের অতীত ভুলের ব্যাখ্যা শুধুমাত্র নিরপেক্ষ আত্মসমীক্ষার দিক থেকেই নয়, এ থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভুল না হয় সেদিকটা দেখাও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য। ঐ ধরনের ভুলে যে বিপজ্জনক বীজ নিহিত রয়েছে এবং একে যদি বাড়তে দেই তাহলে তা আমাদের বিপথগামী করতে পারে। বিপ্লবের রণনীতি, রণকৌশল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে আগের মতো সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা

তৃতীয় যে ভুলটি রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর ও রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র মূল্যায়নে প্রভাবিত করেছে তাহলো অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা। লেনিন সঠিকভাবে বলেছেন যে, যদি কোন রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামরিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর হয় তাহলে সে রাষ্ট্র তার সঠিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না। আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে বিরোধী অংশের সাথে আমাদের যে বাদানুবাদ তাতে দেখা যায়, তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অতিরঞ্জনের দ্বারা চিত্রায়িত করে তাকে বাস্তব ও সম্পূর্ণ মনে করে। অপরদিকে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ছোট করে দেখাচ্ছি। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত নতুন কিছু সম্ভাবনার কারণে, অবশ্য বুর্জোয়া নেতৃত্বে হলেও, তারা সে সব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকটাকে নিশ্চিত করেছে। এ নতুন অবস্থার দুটো দিক রয়েছে. একদিকে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতি অন্যদিকে আপেক্ষিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল হবার দিক। নতুন পরিস্থিতির উপলব্ধিতে ঘাটতির সাথে যুক্ত অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ছোট করে দেখার ফলে কতকগুলো ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। আমি ও আমার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সহকর্মী, কম বা বেশি মাত্রায় অতীতে এ ভুলের জন্য দায়ী। এটা দেখা যাবে পালঘাটের চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসের আগে আমাদের লেখা পুস্তিকায়। আমাদের পার্টির প্রয়াত সম্পাদক অজয় ঘোষ পার্টির নীতি ও কর্মসূচীতে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন আনতে চাইলেন। আমরা কয়েকজন এটা সঠিকভাবেই বুঝতে পারলাম যে, অতীতের কিছু ভুল সংশোধনের নামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদেই সংশোধন আনার বীজ বপন করা হচ্ছে। আমাদের আশংকা সত্যি হল এবং পরিণতিতে শোধনবাদী ডাঙ্গে ও তার সঙ্গিদের বিরোধী মতামত উপেক্ষা করে পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করা হল। এটা ছবির একটা দিক। অন্যদিক হল, আমরা কি সত্যি সত্যি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম? যদিও এর প্রয়োগে অর্থনৈতিক ভিত্তিই মৌলিক, কিন্তু আমরা একে একমাত্র

বিষয় বলে ধরেছিলাম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়কে উপেক্ষা করলাম, বিশেষ করে উদ্ভূত নতুন ও আধুনিক আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতাকে। ফলে বুর্জোয়াদের হাতে এ নতুন স্বাধীনতা তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করবে — এর ব্যাখ্যা আমরা করতে পারিনি কারণ আমাদের বাম সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংশোধনবাদীদের ভুলগুলিকে আমরা তুলে ধরতে ব্যর্থ হই। এ ভুল ও আগের উল্লেখ করা ভুল সঠিকভাবে বুঝতে হবে ও শোধরাতে হবে। সাধারণ সত্য হল, অন্তিম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বিষয়ই নির্ণায়ক বিষয়। কিন্তু এটাও সত্যি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক উন্নতিকে প্রভাবিত করে। এঙ্গেলসের একটি উপদেশাত্বক অংশের উদ্ধৃতিই এ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করবে।

"নব প্রজন্ম কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকটার ওপর প্রাপ্যের অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তার জন্য মার্কস ও আমি আংশিকভাবে দায়ী। আমরা গুরুত্ব দিয়েছি মূল নীতির উপর। পাশাপাশি বিরোধী পক্ষ এটা অস্বীকার করে এবং সর্বদা আমাদের স্থান কাল ও সুযোগের অভাবে অন্যান্য জড়িত বিষয়গুলির প্রতি আমরা যথার্থতা দেখাতে পারিনি।"

তিনি এ বিষয়টি আরও বিশ্লেষণ করেন "ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে শেষ বিচারে ইতিহাসের নির্ণায়ক শক্তি হচ্ছে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। এর বেশি আমি ও মার্কস গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু কেউ যদি একে বিকৃত করে বলে যে, অর্থনৈতিক শক্তিই একমাত্র শক্তি তাহলে এ প্রস্তাব হবে অর্থহীন, বিমূর্ত ও মূঢ় শব্দ সমষ্টি। অর্থনৈতিক অবস্থাই ভিত্তি, কিন্তু উপরিকাঠামোর কিছু উপাদান, শ্রেণিসংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ এবং তার ফল অর্থাৎ বিজয়ী শ্রেণির সংবিধান, বিচারালয়ের সংশোধন এবং এ থেকে উদ্‌গত অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক আইনি ও দার্শনিক তত্ত্ব; ধর্মীয় মতবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট গোঁড়ামীপূর্ণ বিশ্বাস, এভাবেই ইতিহাসের সংগ্রামকে প্রভাবিত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এর আকার ও আকৃতি গঠনে অধিক গুরুত্ব বহন করে। এসব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় অন্তহীন ঘটনা ও দুর্ঘটনা (অর্থাৎ বস্তু ও ঘটনা, আন্তসম্পর্ক যদিও অতিদূর ও প্রমাণের অসম্ভাব্যতার ফলে মনে করতে পারি অস্তিত্বহীন ও তুচ্ছ) অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। অন্যথায় ইতিহাসের যেকোন সময়ে তত্ত্বের প্রয়োগকে কেউ একটা প্রাথমিক সমীকরণের চেয়েও সহজে সমাধান যোগ্য বলে মন করতে পারে।"

উদ্ধৃতাংশের মধ্যেই এর ব্যাখ্যা রয়েছে, নতুন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এটা থেকে একটা শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে যে, অর্থনৈতিক বিষয়ই চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক এবং এর ভিত্তিতে বিদেশি লগ্নিপুঁজির সাথে ভারতীয় বুর্জোয়াদের সহযোগিতা ও নির্ভরতার যে বিপদ তার পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়ন করে, যান্ত্রিকভাবে ও ভ্রান্তভাবে আমাদের এটাকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে ভারতীয় বুর্জোয়াদের চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ বলা ঠিক নয়। নতুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভূমিকা বিচারের সময় একদিকে আন্তর্জাতিক নতুন পরিস্থিতি ও অন্য দিকে দেশে

শ্রেণী বিপ্লবের মাত্রা ও পরিপক্কতা দুটোকে একসাথে মনে রেখে সমঝোতা, সহযোগিতা ও সমর্পণের মাত্রাকে দেখতে হবে। এটা না করে যদি অতিসরলীকরণ করে বলা হয় যে জাতীয় বুর্জোয়ারা বিদেশি লগ্নিপুঁজির সহযোগিতা ও নির্ভরতা বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদের কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করেছে, তাহলে সম্পূর্ণ বিষয়টা বোঝার ক্ষেত্রে বড় আকারে ঝুঁকি থেকে যাবে।

আমাদের সামনে যে খসড়া রয়েছে তাতে অতীতের ভুল ধারণাগুলোকে দূর করা হয়েছে এবং পৃথিবীর শ্রেণিশক্তির আমূল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতের নিরিখে নতুন বোঝাপড়া সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের দলিলের ভুল কতগুলি বিষয়কে দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছে, যেমন, বিপ্লবের দুটো স্তরকে যুক্ত করা, জাতীয় বুর্জোয়াকে সম্পূর্ণরূপে শত্রু শিবিরে ফেলে দেয়া, গণতান্ত্রিক জোট থেকে ধনী কৃষকদের বাদ দেয়া এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক ও ঝুটা বলা ইত্যাদি। ১৯৫১ সালের কর্মসূচী থেকে কয়েকটা বিষয়ে আমরা সরে এসেছি, যেমন, রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণি চরিত্রের মূল্যায়ন, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতি মূল্যায়ন এবং বিপ্লবের শ্রেণি সহযোগী নির্ণয় ইত্যাদি। আমরা এটা জানি যে, ১৯৫১ সালে কর্মসূচীকে স্টালিন ও তৎকালীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব অনুমোদন ও প্রশংসা করেছিলেন। এটা দ্বিতীয় কংগ্রেসের দলিলের চেয়ে একটা অগ্রগতি। এতে সেই সময়েও চলতে থাকা কিছু মৌলিক বিষয় শোধরানো হয়েছিল। তথাপি এটা সংকীর্ণতা ও ডান - সংশোধনবাদী ভুল থেকে বেশ দূরে ছিল। এ ভুলগুলো সম্পর্কে বলার আগে এটা বলে দিতে চাইছি যে, ১৯৫১ সালের কর্মসূচীর দায়িত্ব ও গঠন প্রক্রিয়া ছিল আমাদের নিজস্ব। এটা ভাবা ভুল যে এতে স্টালিন বা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল। এতে তাঁদের কিছু পরামর্শ ও অনুমোদন ছিল এর বেশি কিছু নয়। আমাদের ভুল স্বীকার করা উচিত। অন্যের সাহায্যের স্বীকৃতি দিতে হবে, তা না করে যদি অন্যের উপর দোষ চাপাই ও আত্মোপলব্ধি না করি, সেটা ঠিক হবে না। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্নে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে সর্বদা স্বাগত জানাতে হবে এবং তাদের নিন্দা করা বা অন্যভাবে গ্রহণ করা হবে বড় ভুল।

১৯৫১ সালের কর্মসূচীতে কি ভুল ছিল? সংক্ষেপে এগুলো হল : ১) ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর এবং এর গুরুত্ব, বিশ্বের শক্তি ভারসাম্যের বিপুল পরিবর্তনকে না বোঝা এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বের অবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণি ভারসাম্যের মূল্যায়ন, ২) জাতীয় স্বাধীনতাকে মেনে নেবার নতুন সম্ভাবনা ও একে ভিত্তি করে পুঁজিবাদী পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা। ৩) নতুন জমানার শক্তি ও স্থায়িত্বকে ছোট করে দেখা এবং সরকার বৃটিশের ইচ্ছার উপর ঝুলছে এবং এটা একটা টলমল সরকার পাশাপাশি মানুষের অসন্তোষ, সচেতনতা ও উদ্দীপনাকে বড় করে দেখানো, (৪) সরকারের নিরপেক্ষতার নীতিকে বর্ণনা করা হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের মধ্যে খেলা বলে, পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী আচরণকে

ছোট করে দেখানো হল। ১৯৪৮-৫১ সালের প্রেক্ষিতে এটা আংশিকভাবে সত্যি, কারণ সে সময়ে সরকারের কয়েকটা বিষয়ে মনোভাব তা প্রমাণ করে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোরিয়া আগ্রাসন, সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে নতি স্বীকার, তখন নিজেদের মজবুত করার জন্য ভারতীয় বুর্জোয়াদের শান্তির পক্ষে থাকা প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে দেখতে হবে নতুন আন্তর্জাতিক শ্রেণি বিন্যাসের আঙ্গিকে এবং মনে রাখতে হবে এর মধ্যেই ভারতীয় বুর্জোয়ারা দু'টো শিবিরের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাচ্ছিল। ১৯৫১ সালের কর্মসূচীতে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষকে বৃটিশের উপর নির্ভরতা এবং বৃটিশের বৈদেশিক নীতিই দেশের সরকার গ্রহণ করছে এমন ধারণা আসলে বিদেশনীতির একপেশে মূল্যায়ন। (৫) শ্রেণি নীতিও ছিল স্বাধীনতা পূর্বের মত এবং বিপ্লবের অভিমুখ প্রধানত ছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে, যেমনটা ছিল স্বাধীনতার আগে। ১৯৫১ সালের কর্মসূচীর যদি পুংখানুপুংখ পরীক্ষা করি তাহলে দু'ধরনের ভুলের যৌথ উপস্থিতি দেখতে পাই। একদিকে হচ্ছে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও সংকীর্ণতা ও অন্যদিকে ডান-সুবিধাবাদী বিচ্যুতি। বর্তমান খসড়া কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে এটাকে এ ধরনের ভুল থেকে মুক্ত করে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে স্থাপন করা। একই সাথে এ খসড়ায় ডান-সংস্কারবাদীদের অবস্থান থেকে সরে আসা, যারা নব যুগের ও নতুন সম্ভাবনার নামে সুবিধাবাদী অবস্থান নিচ্ছে। এই শোধনবাদী নীতি তাদের রচিত খসড়া কর্মসূচীতে প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের রচিত খসড়া বর্তমান রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃতিকে কিভাবে দেখছে?

বর্তমান ভারত রাষ্ট্র হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদারশ্রেণি শাসিত রাষ্ট্র। খসড়াতে আরও বলা হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্ব বৈদেশিক লগ্নিপুঁজির সাথে সমঝোতা ও সহযোগিতা করছে। পাশাপাশি পুরনো পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করে সংকীর্ণ শ্রেণিশাসন ও শোষণ চালিয়ে যাবার জন্য জমিদারদের সাথে জোটবদ্ধ হচ্ছে। খসড়ায় এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, একই উদ্দেশ্যে এরা সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে সাহায্য নিয়ে কিছু ভারী শিল্প স্থাপন করছে এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সাথে দর কষাকষি করছে। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদেরকে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো এবং যতটা সম্ভব বিদেশি প্রতিযোগীকে ঠেকানো।

সংশোধনবাদীরা যেমন মনে করেন ভারত রাষ্ট্র হচ্ছে প্রধানত বুর্জোয়াদের অ- একচেটিয়া অংশ দ্বারা পরিচালিত এবং যারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী কাজকে সম্পন্ন করতে সমর্থ। বিপরীতে রাষ্ট্র ক্ষমতার নেতৃত্বে রয়েছে বৃহৎ বুর্জোয়ারা। সংশোধনবাদীদের বিভিন্ন প্রতারণামূলক ও মুখরোচক বক্তব্যের দ্বারা আমাদের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়, যেমন তারা বলেন, "বৃহৎ বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে" প্রায়ই এরা উল্লেখযোগ্য প্রভাব খাটায়" তথাপি "এরা" রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্ণায়ক নেতৃত্ব লাভ করেনি" ইত্যাদি। এ সমস্ত বক্তব্য হচ্ছে আসল এই রুঢ় সত্যটা জনগণের সামনে গোপন রাখা যে বৃহৎ বুর্জোয়া ও এর প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতাকে

কাজে লাগিয়ে তারা জনগণকে বঞ্চিত করে সম্পদের মালিক হচ্ছে। একই সাথে আমাদের বিরুদ্ধে আনা কুৎসামূলক অভিযোগ খণ্ডন করছি। সংশোধনবাদীরা বলতে চাইছে, আমাদের বক্তব্য অনুযায়ী বৃহৎ বুর্জোয়ারা নেতৃত্বদানকারী বৃহৎ শক্তি বলার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতা একচেটিয়া পুঁজির হাতে চলে গিয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও একচেটিয়া পুঁজি এক হয়ে একধরনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সৃষ্টি করছে ইত্যাদি। এটা খসড়ার চরম বিকৃতি, ও সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা খসড়ায় স্পষ্ট করে বলেছি যে, অবৃহৎ বুর্জোয়ারা "একান্ত বৃহৎ বুর্জোয়াদের পক্ষে ক্ষমতা ভাগ করে এবং উচ্চ ধারণা পোষণ করে যে, এ জমানাতেই অগ্রগতি হবে।" আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যদি বুর্জোয়াদের সংকীর্ণ স্বার্থপর জাতীয়তা বিরোধী, জনবিরোধী নীতি চলতে দেওয়া হয় তবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ নিজস্ব নির্দিষ্ট ও বিকৃতরূপে দেখা দেবে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাষ্ট্রের চরিত্রকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে এবং এতে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ভূমিকার স্পষ্টিকরণ করতে হবে। এটা না করার অর্থ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণির প্রতি, গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

সংশোধনবাদীরা যেমন মনে করে, আমাদের রাষ্ট্র মূলত সার্বিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির মুখপাত্র বা প্রতিনিধিত্বকারী এবং জমিদার শ্রেণি বিরোধী। আসলে তা নয়। বিপরীতে বুর্জোয়া নেতৃত্বের সাথে রয়েছে জমিদার শ্রেণির গাঁটছড়া এবং রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা। আমরা দৃঢ়তার সাথে সংশোধনবাদী প্রবক্তাদের কুতর্ককে খণ্ডন করছি। তারা একদিকে সামন্ত ও আধা সামন্ত জমিদারের মধ্যে "চতুর ও সুন্দর" পার্থক্য টানেন এবং অন্যদিকে রাখেন অন্য ধরণের জমিদারতন্ত্রকে এবং যুক্তি দেখান যে "সামন্ততন্ত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে" বড় জমিদারি ও আধা-জমিদারি উচ্ছেদ হয়ে এক সুদূরপ্রসারি পরিণতি ডেকে এনেছে" "বুর্জোয়াদের তুলনায় জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে" এবং এসবের ফলে রাষ্ট্র ক্ষমতা জমিদারদের প্রভাব থেকে মোটামুটি মুক্ত। তারা শুধুমাত্র বুর্জোয়াদের দেয়া কিছু সরকারিপদ ভোগ করছে, তাও যেসব পদ শুধুমাত্র রাজ্যস্তরের, কেন্দ্রীয় স্তরের নয়। কেন তারা এ ধরনের চাতুরির আশ্রয় নেয়? এখানেও সেই একই বিষয়— শ্রমিক ও কৃষককে ধোঁকা দেয়া। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, রাষ্ট্রকে যতটা খারাপ মনে করছ ততটা নয়, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল জমিদাররা রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার নয়। যদি জনগণ রাষ্ট্র ও সরকারের পেছনে থাকে, তবে এটা একদিন সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে দেবে, যেমনটা "ভেঙেছে সামন্ত ও আধা সামন্তের মেরুদণ্ড" এবং এ রাষ্ট্রই ব্যাপক ভূমি সংস্কার করবে।

ভারতীয় রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের ছোট বা বড় অংশীদার নয়, তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনও এখানে নেই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক ও অবাস্তব নয়, যেমনটা খারাপ আগে বলা হয়েছিল। জাতীয় স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে সংশোধনবাদীদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? শুধুমাত্র রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের কারণে, বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের সাথে এর ব্যবসা, অর্থনীতি ও আর্থিক যুগসূত্র, সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের উপর নির্ভরতার

দ্বারা পুঁজিবাদী উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহ, ভারতীয় একচেটিয়া ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং পাশাপাশি জনবিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী, নেতৃত্বে থাকা কমিউনিস্ট বিরোধী চরিত্র বিশিষ্ট বুর্জোয়া জমিদারদের অংশ, এসবের ফলে ভারত রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদেশি লগ্নিপুঁজির আক্রমণের মুখে, যে পুঁজির ক্ষমতা সাধারণ পুঁজির কয়েকশ গুণ বেশি। ফলে ভয় মিশ্রিত এধরনের চাপ আমাদের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তোলার স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। সংশোধনবাদী তত্ত্বের সাথে আমরা একমত নই, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বলছে "এই সহযোগিতা ততটা বিপজ্জনক নয় যতটা বামেরা তুলে ধরছে", "ভারতীয় পুঁজি সহযোগিতার মাধ্যমে খুব দ্রুত বাড়ছে ও শক্তিশালী হচ্ছে", অর্থনৈতিক ও শিল্পের প্রবৃদ্ধি যা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে হচ্ছে তাতে দেশে বৈদেশিক লগ্নিপুঁজির বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীনতা শক্তিশালী হচ্ছে।" "জাতীয় বুর্জোয়ারা, যদিও একটা দুর্বল অংশ, তবুও কল্যাণকর সমাজতান্ত্রিক সহায়তাকে ভিত্তি করে যেকোন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির মোকাবিলা এবং তাকে পরাজিত করতে সমর্থ।

সংশোধনবাদীরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, রাষ্ট্র সরকারের চরিত্র মূল্যায়নে আমরা সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের বিষয়টা এড়িয়ে যাই এবং সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। এরূপ সাহায্য গ্রহণে রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এরূপ সাহায্যের গুরুত্বকেও অস্বীকার করি। আমরা এটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করছি। কিন্তু শিল্প কারখানা স্থাপন ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠা, কিছু প্রকল্প গ্রহণে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দর কষাকষি দেশের সার্বিক শিল্পায়ন ও আমাদের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সাহায্য যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা পালন করছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছি। আমাদের সমালোচনার বিষয় হল রাষ্ট্র ও সরকারের একচেটিয়া বুর্জোয়া নেতৃত্ব দেশ থেকে ক্রমান্বয়ে লগ্নিপুঁজির দাপট কমানো ও অবশেষে দেশ থেকে এ পুঁজি দূর করা যে উচিত ছিল তা না করে ওরা বিদেশি লগ্নিপুঁজিপতিদের সাথে দর কষাকষি করছে, দেউলিয়া পুঁজিবাদী পথে উন্নয়ন ঘটাতে চাইছে, জনগণকে বঞ্চিত করে বিশাল সম্পদের মালিক হচ্ছে এবং অবশেষে নিজের শ্রেণীশাসন বজায় রাখা ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ও দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রুখবার কাজে লিপ্ত রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের একপেশে ও অর্দ্ধ মূল্যায়ন করছে সংশোধনবাদীরা। এ সাহায্যের ভূমিকা মূল্যায়নে এটা তারা দেখতে পারছে না ক্ষমতায় থাকা শ্রেণী একদিকে সাহায্য নিচ্ছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে ভিন্ন প্রকল্পের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে দেশকে ও অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের চাপে রাখছে। সমাজতান্ত্রিক সাহায্য নেবার জন্য সংশোধনবাদীরা বুর্জোয়াদের ভূয়সী প্রশংসা করছে, অন্যদিকে বুর্জোয়ারা যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেশে বিপদ ডেকে আনছে সেটা দেখছে না।

সংক্ষেপে বলা যায়, সংশোধনবাদীরা খসড়া কর্মসূচীতে রাষ্ট্রের যে চরিত্র বিশ্লেষণ করেছে

এ দেখে মনে হয় না যে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিপ্লবের মাধ্যমে বর্তমান শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের কোন প্রয়োজন আছে। প্রশ্নটা হল, বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং এর উপর বৃহৎ ব্যবসায়ীদের প্রভাব সীমাবদ্ধ করা বা নির্মূল করা। প্রশ্ন এটা নয় যে জমিদাররা রাষ্ট্রের কোন পদ অলংকৃত করল কি করল না। লড়াইটা হবে বামপন্থার জন্য শিবির পরিবর্তনের। বুর্জোয়াদের সাহায্য করার জন্য কয়েকজন শ্রমিক প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তিকরণ নয়। এসবই হবে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবিরোধী বিপ্লব সম্পন্ন করার স্বার্থে। যে কেউ এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ সংশোধনবাদীরা শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে বলছে না সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লবে কারা বাধা সৃষ্টি করছে, কোন্ রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শক্তি আজ এ দুটোকে রক্ষা করছে, কার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করে বিপ্লবে জয়লাভ করতে হবে। এসবের অনুপস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি সম্পর্কে বড় বড় কথা আসলে সংস্কারবাদী বচন ও বাক্যে পরিণত হবে। নিজেরাও প্রতারিত হবে এবং জনগণকেও প্রতারিত করবে।